দৈনিক সংবাদ

৪৮

তারিখ ... 14 JUN 1994 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ .....

মাধ্যমিক শিক্ষায় কৃষিবিজ্ঞান প্রাসঙ্গিক ভাবনা

প্রীতি কুমার মিত্র

১৯৯৪–এর এসএসসি পরীক্ষা সবে শেষ হলো। বহুবছর ধরে এ পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০০। আগামী বছরেও এরকমই থাকবে কিন্তু ১৯৯৬ সালের পরীক্ষা অনেক ভিন্ন হবে। তখন আবশ্যিক বিষয় হিসেবে কৃষিবিজ্ঞানের পরীক্ষা দিতে হবে এবং মোট নম্বর হবে ১১০০। যদিও ইতোমধ্যে জানা গেছে পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০০ বলেই ধরা হবে, কিন্তু আসলে পরীক্ষা দিতে হবে ১১০০ নম্বরেরই। কাজেই পরীক্ষার্থীদের বোঝা বাড়তে যাচ্ছে নিঃসন্দেহে।

(১)

মাধ্যমিক স্তরে কৃষিবিজ্ঞান বাধ্যতা–মূলক করার সরকারি ঘোষণার পরে দু'মাসের বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু ১০ই চৈত্র ১৪০০–এর সংবাদ–এ একটি সম্পাদকীয় সমালোচনা ছাড়া বিষয়টির ওপর আর কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চোখে পড়েনি। 'চিঠিপত্র' বিভাগে অবশ্য দু'একখানি চিঠি ছাপা হয়েছে, কিন্তু সেগুলো সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা। বলা বাহুল্য, বিষয়টির ওপর আরো বিস্তারিত আলোচনা এখনো কাঙ্ক্ষিত।

এসএসসি পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা যথেষ্ট দীর্ঘ এবং বইপুস্তকের বোঝা বিলক্ষণ ভারি। তার ওপর আরো ১০০ নম্বরের অতিরিক্ত বোঝা ছাত্রছাত্রীদের ঘাড়ে চাপানোর যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। হাঁসমুরগি ও গবাদি পশু পালন, মৎস্য চাষ, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদিসহ প্রস্তাবিত কৃষিবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচি সুদীর্ঘ হতে বাধ্য। তবে একথা নিশ্চিত যে, তড়িঘড়ি করে কৃষিবিজ্ঞান বাধ্যতামূলক করার পেছনে সরকারের ভিন্নতর কোনো স্বার্থ–পরমার্থ থাক (উক্ত ১০ই চৈত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধের ইংগিত লক্ষণীয়) বা না থাক, পাঠ্য বিষয় হিসেবে কৃষিবিজ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকার করতেই হবে। বাস্তব প্রযুক্তিমূলক এই বিদ্যা শিক্ষা সমাপনের পর জীবিকার্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে এটাই সম্ভবত বাধ্যতামূলকতার পক্ষে প্রবলতম যুক্তি। কিন্তু এও সত্য যে, কৃষিবিজ্ঞানভিত্তিক পেশা অবলম্বন দেশের অনেক শিক্ষার্থীর আর্থসামাজিক পরি–স্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান হলেও শহরবন্দরনিবাসী সুবহু ছাত্রছাত্রীর সাথে খামার–জীবনের কোন সম্পর্ক নেই, মাটির সাথেও তাদের যোগাযোগ অতি ক্ষীণ; মানসিকতা, আর্থিক সামর্থ্য ও সামাজিক যোগাযোগের দিক থেকেও তারা কৃষিসম্পর্কিত পেশার যোগ্য নয়

তাই যেটা হওয়া যৌক্তিক তা হচ্ছে, প্রত্যেক মাধ্যমিক শিক্ষার্থীকে একটি বৃত্তিমূলক প্রযুক্তি বিজ্ঞান আবশ্যিক হিসেবে শিখতে হবে–তা কৃষিবিজ্ঞান হোক, বা কম্প্যুটার, ইলেকট্রনিক্স, কিংবা অন্য কোন পছন্দনীয় বিষয় হোক. এই বাছাইয়ের সুযোগটি দিলে জীবিকা–মুখী পাঠ্যক্রম চালুর কাজটিও হবে, আবার একমাত্র কৃষি বিজ্ঞানকেই নির্বিচারে সবার ওপর চাপিয়ে দেয়ার স্থূলতা থেকেও মুক্ত থাকা যাবে।

তা হলে কৃষিবিজ্ঞানসহ কতিপয় বৃত্তিমূলক প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্য থেকে অন্তত একটি আবশ্যিকভাবে বেছে নেয়ার নীতিটি সমর্থনীয় ও প্রশংসনীয়। অর্থাৎ, এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রত্যেক বিদ্যার্থী একটি বৃত্তিমুখী কারিগরি বিদ্যায় জ্ঞান নিয়ে বেরুক এটি অবশ্যই কাম্য। কিন্তু সেজন্য [illegible] সমর্থনযোগ্য নয়। এতে তাদের কষ্টই শুধু বাড়বে না, জানাশোনার মানও কমতে বাধ্য। তাই বৃত্তিমূলক বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক করার সাথে সাথে এখনকার বাধ্যতামূলক বিষয়গুলোর মধ্য থেকে কোন একটিকে বাদ দিতে হবে। আর সেই পরিত্যাজ্য বিষয়টি হওয়া উচিত অবশ্যই ধর্ম। ধর্মকে আর আবশ্যিক না রেখে ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত করলেই সমস্যার সঠিক সমাধান হয়।

(২)

প্রসঙ্গগত বলা প্রয়োজন যে, ধর্মকে ঐচ্ছিক করার সাথে সাথে তার বিষয়বস্তুরও সংস্কার হওয়া দরকার। এদেশে এখন যেভাবে ধর্ম শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িকতাদোষে দুষ্ট। অর্থাৎ, ধর্ম নয়–বরং ইসলাম, খ্রীষ্টধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম এবং তথাকথিত হিন্দু ধর্ম সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের বিদ্যার্থীদেরকে বিচ্ছিন্নভাবে পড়ানো হয়ে থাকে। এতে এদেশের শিক্ষিত লোকদের মাঝে ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়েছে। নিজের পারিবারিক ধর্ম বিষয়ে একপেশে জ্ঞানের পাশাপাশি প্রতিবেশীর ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বিবিধ ভ্রান্তি নিয়ে ভবিষ্যৎ নাগরিকেরা জাতীয়তা তথা গণতন্ত্র ও মানবতা থেকে উত্তরোত্তর দূরেই সরতে থাকবে। সকল স্বদেশীর প্রতি মমত্ব ও সমবেত দেশপ্রেমের পরিবর্তে মাথাচাড়া দেবে ধর্মীয় শোভিনিজম ও সাম্প্রদায়িক অসূয়া। সুখী, শান্তিপ্রিয় ও সমৃদ্ধিশালী জাতি হিসেবে আত্মবিকাশের সাধ ও সাধনা বিনষ্ট হবে অচিরাৎ।

অতএব ধর্মশিক্ষা অবশ্যই হতে হবে ধর্মনিরপেক্ষ। হতে হবে বস্তুনিষ্ঠ, বিশ্লেষণাত্মক ও অনাধ্যাত্মিক। মানব–অধ্যয়নের অংশ হিসেবেই মানুষের মধ্যে প্রচলিত ধর্মসমূহ অধীত হওয়া উচিত। মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি, শিল্পসাহিত্য ও সদসৎ আরো নানা উত্তরাধিকার সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানার্জন ও মূল্যায়নের স্বার্থে তার ধর্ম তথা বিশ্বাসের জগৎ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তাই ধর্মশিক্ষার সঠিক অ্যাপ্রোচ হচ্ছে তুলনামূলক ধর্ম অধ্যয়ন। নিচের শ্রেণীতে বাংলাদেশে প্রচলিত ধর্মচতুষ্টয়ের পরিচিতি ও সরল আলোচনা এবং উপরের শ্রেণীতে বিশ্বের সকল গুরুত্বপূর্ণ ধর্মের যুক্তিনিষ্ঠ, তুলনাত্মক ও সমাজবিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন বিধেয়।

(৩)

বস্তুত বিষয়টি আরো ব্যাপক। আসলে ধর্ম নয়, বরং ধর্ম যার প্রত্যঙ্গ সেই মানবসভ্যতার তুলনামূলক বিবেচনা আধুনিক মানবসচেতন সভ্যতা ও গণতন্ত্র তথা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মূল্যবোধের পুষ্টির জন্য একান্ত অপরিহার্য। মানুষ ও তার কীর্তি–অকীর্তিকে না জানলে, মানুষকে তার শক্তি ও দুর্বলতাসহ আপন স্বরূপে না চিনলে সত্যিকার মানবপ্রেমী, জনগণমুখী, ইহজাগতিক সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা আন্তরিকতা লাভে সমর্থ হবে না। মিলবে না এই গরীয়ান প্রয়াসের সুবহ বোদ্ধা। সুতরাং তা সফল হওয়ার সম্ভাবনাও অকিঞ্চিৎকর। এ সমস্যার একমাত্র সমাধান ব্যাপক ইতিহাস–সচেতনতা। আর তা সৃষ্টি হতে পারে একমাত্র স্বদেশ ও বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে। বস্তুত পৃথিবীর সকল প্রগতিপ্রত্যয়ী ও মানবোন্নয়নকামী রাষ্ট্রে ইতিহাস একটি অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়। ভারতে [illegible] মাধ্যমিক স্তর [illegible] বাধ্যতামূলক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্নাতক স্তর পর্যন্ত সকল শাখায় বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস অবশ্য পাঠ্য। চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান এবং ইউরোপের প্রমুখ দেশসহ পৃথিবীর বহুতর রাষ্ট্রে, ইতিহাস বুনিয়াদি শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত এবং পাঠ্যক্রমে অন্যতম 'কোর সাবজেক্ট' বা অন্তঃসারভূত বিষয় বলে স্বীকৃত।

কেবলমাত্র ইতিহাস বিকৃতির স্বর্গরাজ্য এই বাংলাদেশেই শিক্ষার কোন স্তরেই ইতিহাস পাঠ্যতালিকায় আবশ্যিক বিষয় নয়। 'সমাজ' 'পরিবেশ পরিচিতি' ইত্যাদি নামের 'একের ভেতরে অনেক কিছু' জাতীয় বইগুলোতে নিচের ক্লাসে যা পড়ানো হয় তাতে দেশের অতীত সম্পর্কে যে দু'চার লফজ আছে তাকে ইতিহাসের ছিটেফোঁটা বললেও ব্যঙ্গ করা হয়। নবম শ্রেণী থেকে আর ও বালাই–ই নেই, যদিও ধর্ম আবশ্যিক হয়ে চেপে আছে শেষ পর্যন্ত। ইতিহাস বাদ দিয়ে সম্প্রদায়গত ধর্মকে আবশ্যপাঠ্য করার মতিচ্ছন্নতা এই দুর্ভাগ্যক্লিষ্ট দেশের অপরিণামদর্শী শাসক–শোষককুলের গভীর মানসিক দৈন্য ও অদেশপ্রেমের পরিচয় বহন করে। পাকিস্তানী আমলেও এমন দুর্দৈব ঘটেনি। যাহোক, এভাবেই দেশের শিক্ষিত সমাজকে বিপুলাংশে ইতিহাস সম্পর্কে অন্ধ করে রাখার স্থায়ী ব্যবস্থা হয়েছে। ফলে অসংকোচে ইতিহাস বিকৃত করে এবং ঘটিত ইতিহাসের বদলে প্রয়োজনীয় মিথ চালু করে আত্মপরিচয় ভুলিয়ে দেয়াসহ নানা উদ্দেশ্য হাসিলের কাজ সহজ হয়ে গেছে। তার মানে আমরা ইতিহাস ছেড়ে দিলেও ইতিহাস আমাদেরকে ছাড়ছে না। সত্য ইতিহাস না জানার ফাঁকা জায়গাটি ভরতে হচ্ছে উদ্দেশ্যবাসীদের তৈরি মিথ দিয়ে। নিজের, আর সব মানুষের, তথা পরিপার্শ্বের সব কিছুর পশ্চাদ্‌ভূমি জানার কৌতূহল ব্যক্তির, গোষ্ঠীর ও জাতির সহজাত প্রবৃত্তি। প্রবণতা হিসেবে এটি অপ্রতিরোধ্য। তাই এই প্রয়োজন মেটাতে যথার্থ ইতিহাস পাওয়া না গেলে কল্পকাহিনী তার স্থান দখল করে। আর স্বার্থান্বেষী মহল খুব হিসেব করে এসব কাহিনী উৎপাদন করে থাকে। অতীত সম্পর্কে জিজ্ঞাসার এই মৌলিকতা এবং বানোয়াট ইতিকাহিনীর হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের প্রয়োজনীয়তা–দুয়ে মিলেই ইতিহাস পাঠের আবশ্যিকতা সৃষ্টি করেছে।

সংসদীয় গণতন্ত্রসহ আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধগুলো ইতিহাস–জ্ঞানের সাথে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার, ভৌতিক ও নৈতিক উন্নয়ন, চিন্তা ও প্রকাশের স্বাধীনতা, নারী ও শিশুর অধিকার, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, এমনকি ওই অতি বিশাল মহিমময় মুক্তিযুদ্ধ–এ সবের বোধ ও গুরুত্ব উপলব্ধির জন্য ইতিহাসচেতনা অপরিহার্য। সাম্প্রদায়িক ধর্মজ্ঞানের পাশাপাশি ইতিহাসে অজ্ঞতা দেশে মৌলবাদ, ধর্মান্ধতা ও অসহন–শীলতার মত বিবিধ বিপ্রতীপ ধারণার পথ প্রশস্ত করে চলেছে। স্বাধীন, জনগণ–তান্ত্রিক, মানবতাবাদী রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতি নির্মাণের স্বপ্ন প্রতিনিয়ত বিধ্বস্ত হচ্ছে. তাই স্বদেশ ও ভূমন্ডলের ইতি–হাসের তাৎপর্যপূর্ণ দিকগুলো স্নাতকপূর্ব সকল শিক্ষার্থীর নিকট রূপরেখায়িত ভঙ্গীতে উপস্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি। তবে এই অপরিহার্য সংযোজনটিও করতে হবে ছাত্রছাত্রীদের বোঝা মোটেই না [illegible]

(৪)

অতি সঙ্গত কারণে ইংরেজি ভাষা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক রাখা হয়েছে। এই আন্তর্জাতিক ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার কোন যুক্তিসঙ্গত অবকাশ নেই। তবে ইংরেজি এদেশে শিক্ষণীয় অবশ্যই দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে। প্রথম ভাষা ও জাতীয় ভাষা বাংলার সমমর্যাদা তার প্রাপ্য নয়। এ মন্তব্যের পেছনে আবেগ ছাড়াও যে অখন্ডনীয় যুক্তি রয়েছে তা আমাদের সকলেরই জানা–মাতৃভাষার সহজ ও সাবলীল মাধ্যম ছাড়া জ্ঞানবিজ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চা এবং সৃজন–মনন বিকশিত করার চেষ্টা সুফলপ্রসূ হয় না। অতএব বাংলার মত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মোট ২০০ নম্বরের দু'টি পত্রে ইংরেজি পড়ানোর সদ্‌যুক্তি আদৌ নেই। প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বারো বছর ধরে প্রতি শ্রেণীতে ১০০ নম্বরের এক পেপার করে ইংরেজি পড়ালে (অর্থাৎ পড়ানোর মত পড়ালে) ওই ভাষায় চমৎকার ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে না পারার কোন কারণ নেই। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় দু'পেপারের বোঝা চাপিয়েও শিক্ষণ ও পরীক্ষণের ত্রুটির জন্য ইংরেজি শিক্ষার মান যে কী মর্মান্তিক তা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। ওই গোড়ায় গলদ দূর করতে পারলে দুই পেপারের ঔপনিবেশিক ভড়ং রাখার আর প্রয়োজন থাকবে না; আধুনিক পদ্ধতিতে এক পেপারের পাঠনেই নিম্নস্নাতক শিক্ষার্থীদের ইংরেজিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করা অবশ্যই সম্ভব। তাতে মেধা, শ্রম ও অর্থের অপচয় রোধ হবে এবং সাফল্যের মাত্রাও বৃদ্ধি পাবে।

এভাবে ইংরেজির বোঝা কমিয়ে সেই খালি জায়গায় ইতিহাসকে নিবেশিত করা যায় অনায়াসে। এতে বোঝা না বাড়িয়েও ছাত্রছাত্রীদের জানাশোনার পরিধি বিস্তৃত করা ও জ্ঞানের সুষমতা আনয়ন সম্ভব হবে। এ ব্যবস্থায় মাধ্যমিক ও উচ্চ–মাধ্যমিক শিক্ষা অধিক ফলপ্রসূ, সদর্থবহ, জাতিগঠনমূলক ও ভ্রান্তিনিরোধক হতে বাধ্য। অতএব, এসএসসি পরীক্ষার্থীদের পাঠ্যতালিকায় :

বাংলা	২০০
ইংরেজি	১০০
গণিত	১০০
ইতিহাস	১০০
ভূগোল	১০০
বৃত্তিমূলক বিজ্ঞান	১০০
মোট	৭০০

নম্বর বাধ্যতামূলক এবং শাখা অনুসারে বিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞানের আরো তিনটি বেছে নেয়া বিষয়ে ৩০০ নম্বর–এই মোট ১০০০ নম্বরের ব্যবস্থা থাকা উচিত। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য বাংলা ২০০, ইংরেজি ১০০ ও ইতিহাস ১০০ বাধ্যতামূলক রেখে বাকি বিষয় বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া যেতে পারে।

বিষয়টির প্রতি সরকারের শিক্ষা, বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা–বোর্ডগুলোর কর্তৃপক্ষ, দেশের শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণ, ও চিন্তাশীল সুধীজনের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। এ নিয়ে আলোচনা–পর্যালোচনা হোক তাও কামনা করি।

(লেখক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ–এ অধ্যাপনারত)